Vol. 58 | No. 3 | 2023

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সমালোচক শঙ্খ ঘোষ: রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ

Volume	58
Issue	3
Year	2023
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Munira Sultana
Published online	June 1, 2023
DOI	10.62328/sp.v58i3.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v58i3.6
Pages	৮৩-৯৪
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সমালোচক শঙ্খ ঘোষ: রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ

Check for updates

মুনিরা সুলতানা

সাহিত্য পত্রিকা

Shahitto Potrika
eISSN 3006-886X
ISSN 0558-1583
Volume 58
Number 3

সাহিত্য পত্রিকা (২০২৩) ৫৮ (৩): ৮৩-৯৪
DOI 10.62328/sp.v58i3.6

সাহিত্য পত্রিকা
বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সাহিত্য পত্রিকা ॥ বর্ষ ৫৮ ॥ সংখ্যা ৩ ॥ আষাঢ় ১৪৩০ ॥ জুন ২০২৩

সমালোচক শঙ্খ ঘোষ: রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ

মুনিরা সুলতানা*

সারসংক্ষেপ: কবিতা, গদ্য কিংবা অন্যান্য রচনাতেও নির্দ্বন্দ্ব কণ্ঠস্বরের নাম শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২-২০২১)। সাহিত্য-সমালোচনা বিশেষত রবীন্দ্র-সাহিত্য মূল্যায়নে শঙ্খ ঘোষ ব্যতিক্রমী সাহিত্যরুচির পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথকে তিনি চেয়েছেন সংবেদনশীল মানুষের উপলব্ধির সীমায় নিয়ে আসতে। তাঁর রবীন্দ্রসমালোচনা বিষয়ক রচনা অজস্র। আত্মদর্শনের অনুসন্ধানের পথ হিসেবে রবীন্দ্রদর্শনের অন্বেষণ সর্বোপরি জীবনযাপনের সাথে রবীন্দ্রনাথকে মিলিয়ে দেখতে চাওয়ার দৃষ্টিভঙ্গিটি তাঁকে অন্যান্য অনেক রবীন্দ্রসমালোচকের চেয়ে পৃথক করেছে। শঙ্খ ঘোষের রবীন্দ্র-অনুধ্যানের নানা বৈশিষ্ট্য উন্মোচনের প্রয়াস রয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে।

শঙ্খ ঘোষ মূলত কবি; গদ্যরচনা কিংবা সমালোচনায়ও তিনি স্বমহিম প্রাবন্ধিক-সমালোচক। তাঁর সমালোচনার প্রধান দুটি ধারার মধ্যে রয়েছে রবীন্দ্রভাবনা ও কবিতা বিষয়ক চিন্তা। আদিপর্বের রবীন্দসমালোচকগণ, বিশেষত ক্ষিতিমোহন সেন (১৮৮০-১৯৬০), অজিতকুমার চক্রবর্তী (১৮৮৬-১৯১৮), চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮), প্রমথনাথ বিশী (১৯০১-১৯৮৫), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০), নীহাররঞ্জন রায় (১৯০৩-১৯৮১), আবু সয়ীদ আইয়ুব (১৯০৬-১৯৮২) প্রমুখ বহুলাংশে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও তাঁর ব্যক্তিত্বের নানা প্রকাশকে প্রেক্ষাপট-সূত্র হিসেবে বিবেচনা করেছেন। রবীন্দ্র-সমালোচনায়ই কেবল নয়, জীবনের সঙ্গে সাহিত্যকর্মকে মিলিয়ে দেখবার এ প্রয়াস উনিশ-বিশ শতকী সাহিত্য-সমালোচনার একটা উল্লেখযোগ্য চারিত্র্যলক্ষণ। প্রমথনাথ বিশী তাঁর রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ গ্রন্থের ভূমিকায় কবিমন উদ্ভাবনের লক্ষ্যে একই সময়ে রচিত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, জীবনী ইত্যাদি মিলিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছিলেন। সাহিত্যিক নিজের সময়-সমাজ কাঠামো নিরপেক্ষ নন – গুরুত্বপূর্ণ জেনেই প্রেক্ষাপট অনুসন্ধানে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে জীবনী। তবে এই জীবনতথ্য অনুসন্ধান যেন অনেকসময়ই হয়ে ওঠে 'ডিটেকটিভগিরি', যা আসলে সমালোচকের কাজ নয়, একথাও প্রমথনাথ বিশী বলেছেন।[১]

সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত জীবন প্রসঙ্গক্রমে এলেও তাকে আধিকারিক করে তোলার ভ্রান্তি থেকে মুক্ত ছিলেন শঙ্খ ঘোষ । তিনি মনে করেন, প্রত্যেক লেখকের একটা অন্তরমহল থাকে যা অন্তর্জীবন অর্থে নয়। অর্থাৎ লেখাটি রচিত হবার মুহূর্তে তার চারপাশে বাইরের সামাজিক-রাজনৈতিক জগতে যা-কিছু ঘটছিল তার সঙ্গে কতটুকু যোগ কীভাবে ঘটছিল তাঁর – এটা জীবনের বাইরের চেহারা; 'কিন্তু লেখকের যে-অংশটা অনেকখানি একান্তভাবে ব্যক্তিগত-মানুষ, তার একেবারে নিজস্ব সুখদুঃখের প্রচ্ছন্ন দিক, নানারকম ব্যক্তিসম্পর্কের মধ্যে ভাঙাগড়ার নানা ইতিহাস, ক্ষয়ক্ষতি সংশয়ের শিউরে তোলা নানা ছোবল, এর

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মধ্যে আছে জীবনের অন্দর।' (শঙ্খ, ২০১৪: ১৩৩) তাছাড়া কবিতার বিচারে ব্যক্তিগত তথ্যের বা নেপথ্যের তথ্য উদ্‌ঘাটন কখনো কখনো অবৈধ বা অবান্তরও হয়ে ওঠে বলে মনে করেন তিনি, যা বুদ্ধদেব বসুও মনে করেছিলেন। সৃজনের প্রেরণা অনুসন্ধানের প্রশ্নে কবির নিরেট জীবনতথ্য জানা কিংবা সৃষ্টিকর্মের সাথে সেসব তথ্য অনুপুঙ্খরূপে মিলিয়ে দেখার চেয়ে বরং কবির অভিপ্রায় খুঁজে নেয়া ভালো তাঁর সৃষ্টিরই স্বরূপ থেকে, সৃজনের সেটি আদি নান্দনিক অভিপ্রায়। কারণ, "কবিতায় যোগ্য প্রমাণটুকু তো কবিতারই মধ্যে থেকে যায়, থেকে যায় সত্যের ছোঁয়া, যাকে বলি কবিতার সত্য এবং যে সত্য প্রকাশিত হলেই হয়ে যায় নির্বিশেষ। এছাড়া কবিতা লিখবার মুহূর্তে কোন্‌টা ছিল কবির অভিপ্রায়, সে ব্যক্তিগত 'খবর' অন্বেষণই পাঠক-সমালোচক বা শিল্পস্রষ্টার কাজ হলে 'শিল্পসাহিত্য হয়ে দাঁড়াত কেবল খবর-বিনিময়ের জায়গা।" (শঙ্খ, ২০১৪: ১৪৮)

শঙ্খ ঘোষের রবীন্দ্র-বীক্ষা আদি-পর্বের সামলোচকগণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্বভাবতই আলাদা। সেখানে জীবনতথ্য কোনো আলাদা গুরুত্ব বহন করে না; বরং ব্যক্তিনিরপেক্ষ সত্য হয়ে বহুধা বিস্তীর্ণ এক প্রসারতার দিকে ধাবিত হয়, যাকে জীবনের ঐক্যতত্ত্ব বলে সম্বোধন করা যায়। শঙ্খ ঘোষ প্রণীত রবীন্দ্র-সমালোচনা বিষয়ক গ্রন্থগুলো হল – *কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক* (১৯৬৯), *উর্বশীর হাসি* (১৯৮১); অনুবাদমূলক রচনা – *ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ* (১৯৭৩), *কবির অভিপ্রায়* (১৯৯৮), *এ আমির আবরণ* (১৯৮০), *নির্মাণ আর সৃষ্টি* (১৯৮২), *ছন্দের বারান্দা* (১৯৭১), *দামিনীর গান* (২০০২), *ছন্দোময় জীবন* (১৯৯৩)। দে'জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত শঙ্খ ঘোষ রচনাবলির ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ডদ্বয় রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক। বাংলাদেশে কথাপ্রকাশ কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ *রবীন্দ্রনাথ* (২০১৪) গ্রন্থে শঙ্খ ঘোষের রবীন্দ্র-সমালোচনার উল্লেখযোগ্য রচনাসমূহ সংকলিত হয়েছে। বিশ্বভারতীতে শিক্ষকতা করার সময়েই রবীন্দ্র-সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা করেছেন শঙ্খ ঘোষ। তাঁর করা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র-রচনাবলির 'গ্রন্থপরিচয়' খণ্ডটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি এক তথ্যবহুল রচনা। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের অভিমত:

> শঙ্খবাবু প্রায় একক শ্রমে নির্মাণ করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র-রচনাবলীর 'গ্রন্থপরিচয়' খণ্ডটি। গণপরিসরের রবীন্দ্রনাথকে নানা সময়ে নানাভাবে ছড়িয়ে দেওয়াই হয়ে উঠল তাঁর লক্ষ্য। ছোট ছোট লেখা। কোনো কোনো ভাবনা, সেই ভাবনাকে ছুঁয়ে সাহিত্য-প্রসঙ্গ, অন্য সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা, এইভাবে সাহিত্য আস্বাদনের একটা রকম তৈরি করতে চাইলেন তিনি। (বিশ্বজিৎ, ২০২১)

শঙ্খ ঘোষের প্রবন্ধ-সাহিত্যের একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ-নাটকের নানা অভিক্ষেপ ও চিন্তাসূত্রের ব্যাখ্যান। তাঁর ভাবনার জগৎ অধিকার করে আছে কবিতা, কবিতার বহু সুর ও বহুল স্বর – বহুপ্রসারিত ও ব্যাপক অর্থে, আর রবীন্দ্রনাথ। আজীবন মানুষের একত্বে বিশ্বাস করেছেন যে কবি এবং যিনি মনে করেন 'সত্যি কথা বলা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই কবিতার।' (শঙ্খ, ১৯৭০: ভূমিকা) তাঁর কাব্যদর্শন নিশ্চিতভাবেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে নানা দৃষ্টিকোণে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক লিখেছেন:

> অনেক রূপান্তর সত্ত্বেও তাঁর জীবনবোধ ও নন্দনচেতনা একই সূত্রে বাঁধা রয়েছে সবসময়। যে সময়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তাঁর জীবন, তার ভিতর জেগেছে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক আলোড়ন, তা থেকে উঠে এসেছে বিমানবিকতার যে গ্লানি, এরই বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদীচেতনা জেগে থেকেছে তাঁর সমস্ত কাব্যসৃজনে। সেই আত্মবোধ থেকেই উন্মেষ ঘটেছে তাঁর কবিতাভাবনার। (মৃণাল, ২০২২: ১০৮-১০৯)

কাকে বলে কবিতা, কেমন হওয়া উচিত তার নির্মাণ পদ্ধতি ও প্রকরণ, কবির ব্যক্তিত্ব ও আত্মবিকাশের সঙ্গে এর সম্পর্ক কী এসব নিয়ে তিনি নিরন্তর ভেবেছেন। নিঃশব্দের *তর্জনী* (১৯৭১) গ্রন্থে কবিতার সংজ্ঞার্থ নির্ণয়ে শঙ্খ ঘোষ বলেছেন:

> একটি লেখা কেন কবিতা হয়ে ওঠে, আরেকটা কেন হয় না, এই প্রশ্নের উত্তর বলা সহজ নয়।... আমরা ভুলতে পারি না যে কবিতা শেষ অবধি একটা সৃষ্টিকাজ। তাই, যখনই দেখতে পাই যে একটি লেখা হয়ে উঠেছে একেবারে নূতন সৃষ্টি, এই একটি অভিজ্ঞতা যা এই প্রথম যেন জেগে উঠল কবির মনে তখনই তাকে বলতে চাই কবিতা।
>
> আর সেইজন্যই কবিতা পড়বার সময়ে আমরা লক্ষ করতে চাই তার রূপটুকু, সেই রূপের মধ্যে জেগে-ওঠা কবির ব্যক্তিত্বটুকু। একথার মানে নয় সে-কবিতার বাণীকে একেবারে অস্বীকার করা। একথার মানে শুধু এই যে, সত্য দেখার গুণে এবং তার অনিবার্য প্রকাশের গুণে সহজ কথাও হয়ে ওঠে বাণীর মতো, তুচ্ছকেও যেন শোনায় ধ্যানের মতো। (শঙ্খ, ২০০২: ১৩)

কবিতার সংজ্ঞার্থে এ পর্যায়ে শঙ্খ ঘোষ কবিতার প্রকাশভঙ্গি কিংবা এর রূপকেই গুরুত্ব দিয়েছেন, গুরুত্ব দিয়েছেন রূপের মধ্যে জেগে ওঠা কবির ব্যক্তিত্বকেও যা খানিকটা অভিব্যক্তিত্ববাদ বা প্রকাশতত্ত্বের মতোই শোনায়। এখানে কবির ব্যক্তিত্ব কেবল 'পারসোনাল ইডিওসিনক্রেসি' বা লিখনশৈলীর স্বাতন্ত্র্য অর্থে নয় বরং কবির ভাব-সামগ্র তথা আত্মসামগ্র প্রকাশের পরিচায়ক। আর শঙ্খ ঘোষ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিরহস্যের অনুসন্ধান করেছেন যেন 'কবিতা সঞ্চারের মুহূর্তগুলোকে নথিবদ্ধ করে।' (পবিত্র, ২০২১: ২৭) রবীন্দ্র-সমালোচনায় শঙ্খ ঘোষের অভিনিবেশ রবীন্দ্র-সৃজনসম্ভারে প্রচ্ছন্ন কবি-মনের বিচিত্র যাত্রাপথের অনুসন্ধানে। কবিতা সৃষ্টির মুহূর্ত, প্রকাশের মুহূর্ত এককথায় কবি-ব্যক্তিত্ব অন্বেষণ। রবীন্দ্ররচনার যে পূর্ণায়ত সামঞ্জস্য ধরা পড়েছে সমালোচকের দৃষ্টিতে, তা তিনি ব্যাপ্ত দেখেছেন রবীন্দ্রনাথের গানে, কবিতায়, নাটকে, উপন্যাসে। সাহিত্য সমালোচনাও মূলত সংযোগসূত্র স্থাপনের প্রক্রিয়া; আর সে সূত্রেই শঙ্খ ঘোষের রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা এগিয়ে চলে।

রবীন্দ্র-সৃজনকর্মে এক 'আমি'র বিবরণ কিংবা নিরন্তর আত্মজাগরণ ও হয়ে ওঠার অবিশ্রাম প্রক্রিয়া কিংবা আত্মদর্শনের ইতিহাস অনুসন্ধান করেন শঙ্খ ঘোষ। প্রথমত তা হয়ে ওঠে কবির ভেতরের সৃজনশীল সত্তার (creative personality) সংহতি বিষয়ক অন্বেষা। ফলে কবিতা, গান, নাটক কিংবা উপন্যাসে রবীন্দ্র-সৃজনসত্তার এক ঐক্যসংহতির খোঁজ পান সমালোচক। রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গে শঙ্খ ঘোষ লেখেন: 'রবীন্দ্রনাথের গান

নিজেকে রচনা করে তুলবার গান। এক বিরামহীন আত্মজাগরণের আত্মদীক্ষার গান: অন্তত সেইখানে সে আমার কাছে ভালো।' (শঙ্খ, ২০১৪: ১৫) সৃজনস্পন্দিত এই সত্তা কিংবা নিরন্তর প্রজ্ঞাবান হবার রূপ-রূপান্তর কেবল হেগেলীয় সংজ্ঞার্থে ব্যক্তি ও পরমের মধ্যে যোগ তৈরি করবার পরম্পরা নয়; কিংবা নয় কেবলই 'আত্মগত আমি'র বোধে আত্ম-আবিষ্কার। রবীন্দ্রনাথের পাঠক হিসেবে সমালোচক শঙ্খ ঘোষ অনুভব করেছেন যে, কবিতা, গান, নাটক বা উপন্যাসের পাঠে পাঠক তার উচ্চারণে আসলে বহন করে এক 'আমি'-কেই। যে 'আমি'র মধ্যে চলে নিরন্তর আমি-তুমি-সে-র সংযোগ কিংবা বিচ্ছিন্নতা। এই আমি 'আত্মগত', 'ব্যক্তিগত' কিংবা যে উপলব্ধিরই প্রকাশক হোক না কেন, শঙ্খ ঘোষ সে অন্বয়-অনন্বয় সংক্রান্ত জিজ্ঞাসায় চালিত করেন রবীন্দ্র-পাঠককে। রবীন্দ্রনাথের 'আমি-তুমি' প্রসঙ্গটি অন্তত দশটি প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন শঙ্খ ঘোষ। এ বিষয়ে বিচিত্র জিজ্ঞাসা ও উত্তরে রবীন্দ্র-সৃজনসত্তার নির্মাণের অভিযাত্রা উন্মোচন করেন তিনি:

> 'আমার মধ্যে এমন আমি আছে যে আমার চেয়ে ঢের বড়ো; আমার মধ্যে তাকে কুলোবে কী করে' – এই কথা যখন লেখেন রবীন্দ্রনাথ, তখন সেই অকুলোন মূর্তিকে ঈশ্বর নাম দিতে পারেন কেউ, কেউ-বা-না-ও দিতে পারেন। এইটে কেবল সত্য যে ধর্মীয়তার বাইরে এই সত্তার অনুভব ভাবুক মানুষমাত্রেরই অনিবার্য অনুভব, তার প্রেম বা প্রকৃতি বা অন্য যে কোনো বোধেই জড়িয়ে থাকে তা। (শঙ্খ, ২০০২: ১২৩-১২৪)

রবীন্দ্র-সংগীত বা কবিতায় এই আমির অনুভব ব্যক্তি আবেগ ব্যাকুলতাকে অতিক্রম করে এক বৃহৎ মুক্তির দিকে যায়, শঙ্খ ঘোষ সেই প্রতিধ্বনির বাক্যিক রূপান্তর করেন কবির সৃজনের বিস্তার থেকে। তাঁর সে অনুসন্ধান যেন হয়ে ওঠে পাঠক-সমালোচকের অভিজ্ঞান প্রাপ্তির এক আত্ম-পরিক্রমা:

> প্রতিদিনের ছোটো ছোটো সেই গ্লানির মধ্যে ঘুরে বেড়াই, ক্লীব হয়ে আসে মন, মনে হয় যেন, 'সর্ব অঙ্গে মাখা ছিল মলিনতা, নিজেকে ঘিরে ঘিরে ঘুরবার ক্লান্তিতে ছেয়ে যাই, যখন জানি যে, 'সত্য মুদে আছে', আমাদেরই দ্বিধার মাঝখানে, তখনই একবার আত্মকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে পড়বার ইচ্ছে হয় জগতের আনন্দযজ্ঞে, তখন আমাদের সবারই মনে হয়, 'আমার আমি ধুয়ে মুছে তোমার মধ্যে যাবে ঘুচে।' ভালেরি তখন লিখতে পারেন 'সেই হলো জাগরণ', আর 'গীতাঞ্জলি'র কবি বলতে পারেন 'আমারে যদি জাগালে আছি নাথ।' কিসের দিকে এই জেগে ওঠা? হয়ে ওঠার মুক্তিতে। মানুষ তখন হতে চায় শুধু আপন সমগ্রতার অভিমুখী, যে-সমগ্রতায় বাইরের পৃথিবীকেও তার চাই। হয়ে ওঠার এই আগুন যাকে ছুঁয়ে যায় একবার, তাকে পৌঁছতেই হয় 'আমি'র দিকে, অর্থাৎ 'তুমি'র দিকে, অথবা 'আমি-তুমি'র মিলন-মুহূর্তের দিকে। (শঙ্খ, ২০০২: ১২৪-১২৫)।

রবীন্দ্রনাথের 'আমি-তুমি' সম্পর্কিত ভাবনায় তাঁর অধ্যাত্মবাদিতার প্রসঙ্গটি যুক্তিনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ করেন শঙ্খ ঘোষ। *গীতাঞ্জলি* কাব্যের বিভিন্ন চরণ কিংবা শ্যামলীর 'আমি' কবিতা – যেখানে রবীন্দ্রনাথের 'আমি'র সত্তায় প্রকাশিত হয় বিশ্বের সত্তা, কবি যখন বলেন: 'অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করছেন সাধনা/মানুষের সীমানায়/তাকেই বলে 'আমি'; তখন

কবিতার কেন্দ্রে দাঁড়ানো সেই বন্ধন-উদ্ভূত বিশ্বসত্তার প্রতিনিধিত্বের প্রকাশকে নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠরূপে ব্যাখ্যা করেন সমালোচক। তাঁর মতে, যদিও '*গীতাঞ্জলির* ভুবন প্রভুময় ভুবন, ঐশ্বরিক বোধ তার আদ্যন্ত ছড়ানো। বুদ্ধদেব একে বলেছেন অপেক্ষার কাব্য, কোনো এক পরম মিলনের জন্য চিরপ্রতীক্ষায় কেটে যায় এর কবিতাগুলি, সেই পরমতার প্রকৃতি অস্বীকার করে *গীতাঞ্জলি* পড়া শক্ত।' (শঙ্খ, ২০১৪: ২৯) তবু কোনো বিশেষ ধর্মীয় ঈশ্বর অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য নিয়ে না পড়লেও কোনো সমস্যা হয় না অথবা এ কবিতাগুলো পাঠ করবার সময় পাঠকের বা গানের শ্রোতার দিক থেকে ধর্মীয়তার প্রয়োজনও এখানে নেই, বরং যিনি 'নিরীশ্বরবাদী' আধুনিক, তাঁকেও আবিষ্ট করে রাখে *গীতাঞ্জলি*। কারণ এতে পরমের জন্য আকাঙ্ক্ষা ছাড়াও রয়েছে মানবজীবনের প্রগাঢ় স্বীকৃতি। শঙ্খ ঘোষ মনে রবীন্দ্রনাথের চিত্তগভীর অনুভবলব্ধ সেই 'আমি' কিংবা 'তুমি' সত্তা 'যেন সকলেরই নিভৃত প্রাণের কোনো দেবতা, আত্মশক্তি যেন সকলের। প্রাণের লক্ষ্যে কোনো দেবতা নন, প্রাণই এখানে দেবতা সেটা মনে রাখা চাই।' (শঙ্খ, ২০১৪: ৩১) শঙ্খ ঘোষের কাছে রবীন্দ্রনাথের এই দর্শন শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে আত্মদীক্ষা কিংবা আত্মসত্তারই প্রত্যক্ষণ, সংবেদনশীল মানবমনে যে প্রত্যক্ষণ বা অভিজ্ঞানের সচল প্রবাহ নিয়ত বিদ্যমান থাকে। আর এটাই রবীন্দ্র-দর্শনে অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতা। শঙ্খ ঘোষের মতে, গীতাঞ্জলি পর্বের কবিতা ধর্মীয়তা নিরপেক্ষভাবেও তাই আধুনিক হয়ে ওঠে; হয়ে ওঠে শুদ্ধ কবিতার মগ্ন প্রকাশ।

শিল্পের অর্থ যে নির্দিষ্ট ছকে হয় না; পাঠকের পাঠ-ও হতে হয় আত্মযোগে কিংবা একাত্মতায়, শঙ্খ ঘোষের রবীন্দ্র-সমালোচনা পড়লে তা উপলব্ধ হতে থাকে। কবিতার স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে শঙ্খ ঘোষ একসময় বলেছিলেন যে সত্য কথা বলাই হলো কবিতার একমাত্র কাজ। সে সত্য আসলে একটা সম্মিলন; কেননা, 'আমাদের একটা ব্যক্তিগত সত্য আছে, সমাজের সত্য আছে, গোটা জীবনেরও কোনো সত্য প্রচ্ছন্ন আছে কোথাও। তিনদিক থেকে এসে কোনো-এক বিন্দুতে এদের সংঘর্ষ হয় একটা, আর সেটাই হয়ে ওঠে কবিতার সত্যের মুহূর্ত।' (শঙ্খ, ২০১১: ১৯) একটা ভেতরের আমি আর একটা বাইরের আমি এই দুই সংমিশ্রণে কবি শঙ্খ ঘোষও কবিতায় ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর জীবনজনিত অনুভব। তাঁর কবিতার অন্যতম শক্তি হলো এক জনমুখী নান্দনিকতা। আধুনিক জীবন ও জগতের বাস্তবতা যুগপৎভাবে নির্মাণ করেছে শঙ্খ ঘোষের কবিতাভুবন। তাঁর কবিতায় 'আমি'র মধ্যে গতিশীল 'আমরা' মূর্ত হয়ে ওঠে প্রায়ই। রবীন্দ্রনাথকেও এক গণপরিসরের মঞ্চে আবিষ্কার করেন তিনি। অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে দেখান কী করে ব্যক্তিগত সত্য সঞ্চারিত হয় সমাজের সত্যে। যে আত্মশক্তি বলে নিজের ভেতরে নিজেকে পেয়েছেন কবি, তা-ই একসময় হয়ে ওঠে বৃহৎ মুক্তির প্রত্যাশা। শঙ্খ ঘোষের (২০১৪: ৭৪-৭৫) ভাষায়:

> যতই সে তার আমিকে পায়, ততই সে যুক্ত হয়ে ওঠে বিশ্ব-ব্যাপী এক না আমির সঙ্গে, আর সেইটেকেই বলি মুক্তি।
>
> ... আত্মশক্তির যে উদ্‌বোধনকে রবীন্দ্রনাথ মুক্তিমন্ত্র বলে ভেবেছিলেন, সে কেবল কোনো ব্যক্তির মুক্তি নয়, সে হল জাতির মুক্তি, এমনকী মানুষের মুক্তি। আত্মশক্তির এই জেগে ওঠাই হলো তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়ো মানুষের ধর্ম ।

'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে সর্বতোভাবে জাগ্রত করা চালনা করাই আত্মরক্ষার প্রকৃত উপায়।' শঙ্খ ঘোষ রবীন্দ্রনাথের এ ভাবনাকে একীকৃত করে দেখেন তাঁর ব্যক্তি, সমাজসাধনা আর আত্মসাধনার সাথে: 'দেশের আত্মপরিচয় আর ব্যক্তির আত্মপরিচয় তাই এক বিন্দুতে এসে মিলে যায় তাঁর মনে, তাঁর আমির সাধনা গভীরতর অর্থে তাই হয়ে ওঠে দেশেরও সাধনা।' (শঙ্খ, ২০১৪: ৭৯) রবীন্দ্রনাথের কবিতা কিংবা গানই নয়, আত্মশক্তি ও তার বৃহৎ সঞ্চারের এই অভিজ্ঞান শঙ্খ ঘোষ উপলব্ধি করেন তাঁর উপন্যাসেও। *গোরা, চতুরঙ্গ* বা *ঘরে বাইরের* মতো রচনাগুলোকে সমালোচকের কাছে মনে হয় 'প্রায় আত্মদর্শনের কোনো ইতিহাস। (শঙ্খ, ২০১৪: ৭৯) যেটা আসলে পূর্ণতার পথ এবং এভাবেই সমস্ত কাল আর সমস্ত দেশের সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়ে মুহূর্তের জন্য জেগে ওঠে আমাদের সত্তা, অন্তঃস্বরূপের উদ্‌বোধন। উপন্যাস, গান, নাটক বিশেষত রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের সৃষ্টিকর্মে শঙ্খ ঘোষ এক ঐক্যবদ্ধতার সূত্র অনুভব করেন। রবীন্দ্রনাথের আত্মদর্শনের কেন্দ্রসুর কিংবা তার ইতিবৃত্তের তল উপলব্ধ হয় সমালোচকের পাঠে:

> তাঁর উপন্যাসে বা নাটকে বা গানে একইভাবে তিনি তখন প্রকাশ করে যান তাঁর আমিত্বের বোধটিকে, তাঁর হয়ে ওঠার ধারণাকে। 'একটু ক্ষয়ে ক্ষতি লাগে, একটু ঘায়ে ক্ষত জাগে' যে-আমির, তার হাত থেকে নিজেকে যে মুক্ত করে নিতে চাইছেন তিনি, সে কেবল তাঁর গানেরই কথা থাকে না আর, থাকে না শুধু কবিতারই কথা হয়ে, 'গোরা' থেকে 'ঘরে-বাইরে' পর্যন্ত তাঁর সমস্ত রচনারই মূল কেন্দ্রটি ধরা থাকে সেখানে। গোরা শচীশ বা নিখিলেশের মতো চরিত্র রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তখন তাই অনিবার্য হয়ে ওঠে। (শঙ্খ, ২০১৪: ৮২)

কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস কিংবা নাটক সম্পর্কে শঙ্খ ঘোষের অনুপুঙ্খ রবীন্দ্র-সন্ধিৎসার অনবদ্য পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি মনে করেন, বাংলা নাটককে 'নাটুকেপনা' থেকে মুক্তি দেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাতে যোগ করেন নিজের বা নিজেদের মুক্তির কথা। তাঁর *কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক* গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের দর্শন, ফর্মের বিন্যাসে কিংবা নাট্যগড়নে সংহত ও সন্নিহিত কালের মাত্রা তথা সময়ের ব্যবহার সম্পর্কে মগ্ন আলোচনা দেখতে পাই । ফর্ম-এর দিক থেকে দেখা যায়, *ডাকঘর* নাটকে সীমিত কাল সীমাহীন কালের দিকে প্রবাহিত হয়ে যায়। আবার *ফাল্গুনীতে* আবদ্ধ সময়ের মধ্যেই থাকে অন্তহীনের অনুরণন। সীমার মধ্যে অসীমের যে উত্তরণের প্রক্রিয়াটি রবীন্দ্রদর্শনের একটি বিশেষ মাত্রা – রবীন্দ্র-নাটক বিশ্লেষণে সে উত্তরণেরই ইঙ্গিত দেন সমালোচক।

দামিনীর গান গ্রন্থের 'গান আর ধর্ম' নিবন্ধে শঙ্খ ঘোষ রবীন্দ্রনাথের গানের মননক্রিয়া সম্পর্কে পাঠককে উপলব্ধি করান, কারণ রবীন্দ্রনাথের গান আমাদের পৌঁছে দেয় এমন এক বোধে, যাকে বলা যায় ধর্মবোধ। এটা আসলে এক ধরনের মুক্তিও, কারণ অন্তঃস্বরূপ আর বিশ্বপ্রবাহের ব্যাপ্তস্বরূপ তখন একাত্ম হয়ে যেতে পারে। ফলে সংগীতের ভেতর থেকে জীবনের সামনে দাঁড়িয়ে ব্যক্তির প্রসারণও লাভ করা যায়। এই প্রসারণ মূলত বিরূপ সময়ের এক ধরনের প্রতিরোধ। ফলে জীবন থেকেই সৃষ্টি হয় বেদনা, বিচ্ছিন্নতা ও

অবসাদের 'হিলিং ইফেক্ট' বা মনের শুশ্রূষার শক্তি। তাঁর নাটকে নাচ-গান-গদ্য-পদ্যের ব্যবহার যে দেশ-কাল-সময়-সমাজ ভাবনার রূপ; সে বিষয়ে *কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক* গ্রন্থে আলোকপাত করেছেন শঙ্খ ঘোষ। এ প্রসঙ্গে বলেন:

> কথার ভিতরকার সুর আবিষ্কার করে বক্তব্যকে সংহত রূপ দেওয়াই রবীন্দ্রনাথের বহুদিনের অভিপ্রায়, কিন্তু ভাষার বহিরঙ্গ সমস্যা তাঁকে বারংবার সেই লক্ষ্যভূমি থেকে বিচলিত করেছে দেখতে পাই। কিন্তু এখন গানের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করতে পারবার নিঃসংশয় আত্মস্থতায় পৌছলেন তিনি। ফলে অন্তঃস্থিত জটিলতাও যেমন তিনি দেখাতে পারছেন নৃত্যনাট্যের চরিত্রাবলিতে, তেমনি সুরের সাহায্যে আমাদের বিষয়ের গূঢ় মর্মে নিয়ে যাওয়াও সম্ভব হলো তাঁর অন্ত্যযুগের নাট্যচর্চায়।... 'বাল্মিকীপ্রতিভাত আর 'মায়ার খেলা''... এখানে ভাষা কেবল গানের নয়, উপযোগী নাচেরও ভাষা সম্পূর্ণ আয়ত্তে এখন। (শঙ্খ, ২০০২ : ৬০-৬১)

শঙ্খ ঘোষ তাঁর সমালোচনায় দেখান 'আমাদের' জীবন ঋতু-ব্রত-নাচ-গান-সুর-লয়-শ্রম নিয়ে। সুতরাং নাটকে গান, সুর, কাব্য কিংবা নাচের ব্যবহারে রসভঙ্গ হয় না; বরং তা হয়ে ওঠে 'স্বাভাবিক আত্মপ্রকাশের এক অনিবার্য উপায়।' (শঙ্খ, ২০০২: ৫৮) এভাবে কবির কাছে সমস্ত শিল্পমাধ্যমই হয়ে ওঠে নিজেকে জানবার পথ।

রবীন্দ্রনাথের নাটক আলোচনায় ইউরোপীয় বিভিন্ন নাট্যকার বা সংগীতজ্ঞ যেমন ক্রিস্টোফ উইলিবাল্ড গ্লুক (১৭১৪-১৭৮৭), লুডউইগ ভ্যান বীঠোফেন (১৭৭০-১৮২৭) বিশেষত রিচার্ড ওয়াগনারের (১৮১৩-১৮৮৩) 'মিউজিক ড্রামা'র প্রসঙ্গ এনেছেন সমালোচক বার্ণিক রায় ও দেবতোষ বসু। পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ গুক, বীঠোফেন ও ওয়াগনারের কলাকৃতির সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন বলে বার্ণিক রায় তাঁর 'পাশ্চাত্য অপেরা, গীতিনাট্য ও জ্বানের' (১৯৮৯) নামক নিবন্ধে লিখেছেন। 'অপেরা প্রভৃতি পাশ্চাত্য সঙ্গীত যা বলতে চেয়েছে তা যেন বাণীর সহযোগিতা ছাড়া ব্যক্ত হতে পারে না, এসব অপেরার সাহিত্য বিষয়ও পরিপূর্ণ প্রকাশের জন্য সঙ্গীতের জন্য অপেক্ষা করে' (উদ্ধৃত, অরুণকুমার, ১৯৬৫: ২৭০) – এমন মত রবীন্দ্রনাথেরই বলে লিখেছেন সমালোচক ।

রক্তকরবী ও অন্যান্য নাটকে প্রতিফলিত রবীন্দ্রনাথের ভাব-দর্শন প্রসঙ্গে সমালোচক শঙ্খ ঘোষের ভিন্নধর্মী পাঠ রয়েছে। নাটকে প্রতিফলিত রবীন্দ্র-দর্শনের রূপ-রূপান্তর বিশ্লেষণ করেছেন তিনি। রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ গ্রন্থে প্রমথনাথ বিশী দেখিয়েছিলেন যে, তত্ত্বনাটকগুলোর টেকনিকের মূলে কোনো বিদেশি নাটকের আদর্শ নেই। রবীন্দ্র-নাটক বিবেচনায় *রক্তকরবী* নাটকের প্রতিই সবচেয়ে বেশি পক্ষপাত লক্ষ করা যায় শঙ্খ ঘোষের। সুইডিশ নাট্যকার অগাস্ট স্ট্রিন্ডবার্গের (১৮৪৯-১৯১২) *A Dream Play* (১৯০২) নাটকের বিষয়, সংলাপ ও কেন্দ্রীয় প্রতীকের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ করেছেন তিনি। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নাটকের সাথে তুলনা করে রক্তকরবীর শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয়ে তিনি বলেন:

> 'ডাকঘর'-এ সময় আর সুন্দর, 'শারদোৎসবে' ছুটি আর কাজ, 'রাজা'-র প্রেম আর ধ্যান, 'অচলায়তন'-এর মানুষ আর সমাজ, 'মুক্তধারা'-র ইতিহাসবেষ্টিত সমকাল আর 'ফাল্গুনী'-র জরামৃত্যুহীন মুক্ত চিরন্তন, যেন এ সবেরই মিলিত সমবায় হয়ে আসে 'রক্তকরবী'। (শঙ্খ, ১৯৬৯: ১৬১)

নাটকে সময়ের ব্যবহার, বাস্তব বাস্তবাতীত দ্যোতনার সমন্বয় এবং সর্বোপরি সীমার মধ্যে অসীমের উত্তরণ – প্রভৃতি শিল্পকাজ নির্দেশ করেন সমালোচক। বাংলা নাটকের সম্পূর্ণ স্বকীয় নাট্যবিন্যাস এবং 'তার লোকজীবনের সঙ্গে ঘন সম্পর্কে যোজিত এক নাট্যরূপ' একমাত্র রবীন্দ্রনাথই জেনেছিলেন বলে মনে করেন শঙ্খ ঘোষ। সার্ত্র, ইয়েটস, ব্রেখ্‌ট প্রমুখের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে ও স্বঅনুধাবনের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র-নাটকের আলোচনায় তিনি দেখিয়েছেন কী করে রবীন্দ্রনাথ সমগ্রকে আধার করে বৃহৎ উজ্জ্বলতায় পৌঁছলেন, তাঁর নিজস্ব মুক্তি কী করে সামগ্রিক মুক্তির পথ প্রশস্ত করেছে।

রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা প্রসঙ্গটি সমকালে বুদ্ধদেব বসুসহ পরবর্তীকালে আবু সয়ীদ আইয়ুব পর্যন্ত অনেকেই আলোচনা করেছেন। আধুনিকতার সমস্যার সঙ্গে অনিবার্যভাবে জড়িয়ে আছে ঐতিহ্যের সমস্যা। কালের প্রশ্নে আধুনিক সময়ের একজন কবি হিসেবে শঙ্খ ঘোষও তা এড়িয়ে যেতে পারেন না। প্রথম যৌবনেই তিনি জেনেছেন রবীন্দ্রবিরোধিতা আধুনিকতাবাদের প্রথম শর্ত, শুনেছেন বুদ্ধদেব বসুর ঘোষণা, 'The age of Rabindranath is over।' (বুদ্ধদেব, ২০০৯: ১৪৯) এই বিগ্রহভাঙা (Iconclast) প্রবণতা শঙ্খ ঘোষ পরিণত যৌবনে দেখেছেন তাঁর 'কমরেড'দের মধ্যেও, যাঁরা সবাই কোনো না কোনোভাবে বুদ্ধদেব বসুর ঘোষণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ সূত্রে একজন কবির জিজ্ঞাসা নিয়েই তিনি দাঁড় করান রবীন্দ্রনাথকে। আধুনিকতার প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের দ্বিধা ও স্ববিরোধকে স্বাভাবিক বিচার করে তিনি তাঁর সাহিত্যরুচির বিশ্লেষণ করেছেন:

> বড়ো প্রতিভা সময়কে আত্মস্থ করে নিয়েই অতিক্রম করে সময়। সেই আত্মস্থতার আয়োজনে সবসময়ে কোনো সামঞ্জস্যময় সম্পূর্ণতাকে নিশ্চয় ছুঁতে পারছিলেন না রবীন্দ্রনাথ, নানা ভিন্ন কোণ থেকে ধরতে চাইছিলেন সাম্প্রতিক অলিগলি। এরই ফলে মুহুর্মুহু তাঁকে আলোড়িত হতে হয়েছে প্রবল এক আত্মবিরোধে, কিন্তু সাহস নিয়ে সেই আত্মবিরোধকে বরণ করে নিতে চেয়েছিলেন বলেই তিনি আধুনিক। (উদ্ধৃত, সৈয়দ কওসর, ২০২১: ৭৯)

আর বিপরীত স্রোতের আঘাত নিয়েই 'শৃঙ্খলা আর সামঞ্জস্যের কোনো কেন্দ্র খুঁজে নিতে নিতে, গড়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। তাঁর সৃষ্টি তাই প্রতিমুহূর্তের পরিবেশের প্রতি আঘাত, যা আছে তাকে প্রত্যাখ্যান।' (শঙ্খ, ২০১৪: ১১১) নিজেকে সৃষ্টি করা কিংবা নিজের মুখশ্রীকে পাল্টে দেবার ইচ্ছেই রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতার সবচেয়ে বড় লক্ষণ। শঙ্খ ঘোষ মনে করেন নির্মাণ আর সৃষ্টি রবীন্দ্রসৃজন চৈতন্যের দুই প্রান্ত। দুটি পরস্পর-সম্পৃক্ত; সৃষ্টির প্রতিটি পর্যায়েই থাকে নির্মাণের সৌকর্য, কখনো তা সৃষ্টির উদাত্ততায় পৌছায়, কখনো-বা নির্মাণেই সীমিত থাকে। আধুনিকতার সংগঠনে এই দ্বৈতের সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই তিনি পৌঁছান নিজস্ব দার্শনিক ও নান্দনিক উপলব্ধিতে। রবীন্দ্রনাথ ও

সমকালীন আধুনিকতা বিষয়ে শঙ্খ ঘোষের উদার, যুক্তিপূর্ণ এমন সব মূল্যায়ন তাঁকে রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসায় বিশিষ্ট ও স্বকীয় করে তোলে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শ, কবিতার বোধিপরিণতি শঙ্খ ঘোষ পাঠ করেন এক বিস্তারের আততি নিয়ে। 'তাঁকে (রবীন্দ্রনাথকে) প্রবহমান সময়ের যে নিয়ত পরিবর্তনশীল আধুনিকতা – যা 'সাম্প্রতিক' নয়, আধুনিক – বলা যেতে পারে চিরকালের সেই রূপে তো দেখতে চেয়েছেন ব্যক্তি শঙ্খ ঘোষও। তাই তিনি যে রবীন্দ্রকবিতার সংকলন করলেন– তা *সঞ্চয়িতা* নয়, তা *সূর্যাবর্ত*।' (সুমন, ২০২১: ৬৯) আধুনিকতার ধারাবাহিকতায় কেমন করে রূপান্তরিত হয়েছে রবীন্দ্র-চেতনা, কী করে পরিশীলিত ও পরিশুদ্ধ করেছেন তাঁর জীবনবোধ ও বিশ্বাস, তার বিশ্লেষণ আছে শঙ্খ ঘোষের সমালোচনায়। তিনি এও মনে করেন:

> যে আধুনিকতার কাছে স্থায়িত্বের চেয়ে বদলের ভূমিকা অনেক বড়ো, হয়ে থাকার (Being) চেয়ে অনেক বড়ো হয়ে ওঠার (Becoming) বোধ, ঐতিহাসিক আর প্রারম্ভিক কালকে একসূত্রে বেঁধে নিয়ে সেই আধুনিকতার দিকেই এইভাবে চলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, পর্ব থেকে পর্বে। (শঙ্খ, ১৯৮২: ২৯৮-২৯৯)

রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-নিরীক্ষা সম্পর্কেও শঙ্খ ঘোষের আলোচনা গতানুগতিক নয়। *ছন্দের বারান্দা* গ্রন্থটিতে কবিতা, ছন্দ এবং ছন্দের অন্তঃশীল রহস্য ও স্রোতপ্রবাহ সম্পর্কিত ভিন্নরকম আলোচনা রয়েছে। 'ছন্দের বন্ধনের মধ্য থেকেও কীভাবে সম্ভব তার থেকে মুক্তি খুঁজে পাওয়া; পদ্যছন্দ আর গদ্যছন্দের আপাত-বিরোধের মধ্যে কোথায় আছে সামঞ্জস্যের সম্ভাবনা– সমালোচক শঙ্খ ঘোষের অনুরাগী সমালোচনায় সে অনসুন্ধান পূর্ণ হয়ে ওঠে।' (পিনাকেশ, ২০১২: ২৩৮) শঙ্খ ঘোষ অনুভব করেন, বাস্তব জীবনপ্রবাহের মধ্য দিয়ে চলা এমন সব ধ্বনি বা শব্দযোজনা রয়েছে যা আপাত গোপন এবং যা সাহিত্যিকের সংবেদনায় বাস্তব ও বাস্তবাতীত দ্যোতনারূপে সমন্বিত হয়ে ওঠে। তাঁর ভাষায় :

> আমাদের সমস্ত শরীর-যন্ত্রের মধ্যে যে-ছন্দ লুকোনো আছে তাকে আমরা প্রকাশ করতে পারি না সমস্ত সময়ে, বাস্তবের সেই টুকরো প্রকাশই হলো গদ্যের জগৎ আর আমাদের সমস্ত স্ফুরণই হল কবিতা, সেই প্রস্ফুরণে আমরা কেঁপে উঠি ছবিতে ছন্দে। (শঙ্খ, ১৯৬৯: ৫৩)

কবি শঙ্খ ঘোষের সংবেদনা তাঁর সমালোচক সত্তাকে প্রভাবিত করেছে কি না সে ব্যাপারে সমালোচক-অভিমত থাকাটাই স্বাভাবিক। তাঁর গদ্যের স্বাদুতা গুণকে প্রশংসা করেছেন অনেক সমালোচক, প্রথমত তা কবিরই গদ্য জেনে। তবে কবিত্ব ও সাহিত্যসমালোচনা শঙ্খ ঘোষের দুটো স্বতন্ত্র সত্তার প্রকাশ। কবিত্বের বোধ তাঁর বিচারবোধকে প্রভাবিত করেছে হয়তো, কিন্তু সমালোচক হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশে নিজস্বতার চিহ্ন অক্ষুণ্ন থাকে। শঙ্খ ঘোষের সাহিত্যবিচার প্রসঙ্গে সমালোচক বলেন:

> কেবলমাত্র কবিতার ব্যাখ্যাতা হিসেবে নয়, আমাদের সময়ে অন্যতম রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ হিসেবে, শিল্প ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ অনুধাবক হিসেবে এবং শিল্প ও জীবনের

> বহুমুখীনতার প্রতি দায়বদ্ধ মানুষ হিসেবে গদ্যের লেখনীও তাঁকে তুলে নিতে হয়েছে, এবং তাতে বাংলা সাহিত্য-সমালোচনার ধারা যে ক্রমশই লাভবান হচ্ছে একথা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না।
>
> ... কবি যখন গদ্য লেখেন, তিনি কি তাঁর কবিসত্তাকে ছেড়ে আসেন, না কি তাঁর কবিসত্তা ও নিবন্ধকার-চরিত্র সমান্তরালভাবে এগোতে থাকে? শঙ্খ ঘোষের গদ্যরীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর গদ্যরচনায় কখনোই তাঁর এই দুই সত্তা পরস্পরের প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠে না এবং কখনোই সমান্তরাল গতিসম্পন্ন হয়ে উঠতে চায় না।... তাঁর গদ্যরীতির মধ্যে সমন্বয় ঘটে গদ্যের ঋজু সামর্থ্য ও কবিত্বের লাবণ্যের। কবিতার নয়, কবিত্বের, যে কবিত্ব থাকে 'রচনার নিহিত নির্যাসে'। বস্তুত শঙ্খ ঘোষের গদ্যে এই দুই সত্তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আমরা টের পাই না, বরং দেখি যে এই দুইয়ের জটিল ও সূক্ষ্ম সংমিশ্রণে তাঁর গদ্য হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য। (ভারতী, ২০০০: ৩০৮ ৩০৯, ৩১২-৩১৩)

সমকালীন জিজ্ঞাসা নিয়েই রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা শঙ্খ ঘোষ করেন এবং সে নিরিখেই রবীন্দ্রপাঠে অগ্রসর হয়েছেন তিনি। সমালোচনায় তথ্যকে বিন্যাস করেছেন আস্বাদনের সূত্রে; রবীন্দ্রবীক্ষার এইরকম দৃষ্টিকোণ সমালোচক শঙ্খ ঘোষকে আলাদা করেছে। রবীন্দ্রসৃষ্টির বিচারে সমগ্রতার পদ্ধতি আগাগোড়া অনুসরণ করেছেন শঙ্খ ঘোষ। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মূল্যায়ন হলো:

> রবীন্দ্র-সৃষ্টিশীলতার সমস্ত দিক – কবিতা গান নাটক উপন্যাস গল্প, এমনকি, ছবির ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রচেতনার যে বৈশিষ্ট্য প্রবাহিত হয়েছে সেই চেতনার মৌলিক ঐক্যটিকে ধরতে চেয়েছেন তিনি। এক একটি সাহিত্যশাখার নিজস্ব অর্থ নিশ্চয়ই আছে, তবে সামগ্রিকভাবে যে মূল চেতনা তার আবিষ্কারে মগ্ন থাকেন তিনি।... এ কারণে রবীন্দ্রনাথের গানকে শুধু গানের পটভূমিতেই দেখেন নি, সৃষ্টির নানা শাখা থেকে আহরণ করেছেন তিনি আলোচনার উপকরণ, যা সেই ঐক্যসূত্রের দিকে আমাদের নিয়ে যায়। আর এখানেই শঙ্খ ঘোষের রবীন্দ্র আলোচনা বিশিষ্টতা লাভ করেছে। (সৈয়দ কওসর, ২০২১: ৭৯)

মূলত এক ব্যাপ্ত মানবিক প্রেক্ষপটেও রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে চেয়েছেন তিনি। যে সমগ্রতার সমবায় হিসেবে কবিতাকে দেখেছেন তিনি, তাঁর সে নন্দনভাবনার সহযোগেই রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের যাত্রারম্ভ, তাঁর সত্য-সুন্দর, তাঁর আনন্দ-মঙ্গল চেতনা, দ্বন্দ্ব ও উত্তরণের এক সমগ্র প্রতিচ্ছবি পাঠকের সামনে উন্মোচনের চেষ্টা করেন শঙ্খ ঘোষ। পার্থপ্রতিমের অনুধাবন:

> কবিতা বিষয়ী ঠিক, মানুষও তাই, কিন্তু তার প্রকৃত অবস্থা কী, কোন সমাজ দৃশ্যে মানবদৃশ্যে প্রকৃতিদৃশ্যে সে লগ্ন, এই বিবেচনাও যেহেতু শঙ্খ ঘোষের নন্দনভাবনায় লেগে থাকে, সেহেতু রবীন্দ্রনাথ বারবার তাঁর কবিতার উজ্জীবনলোকে আসেন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে। এর অর্থ এই নয়, শঙ্খ ঘোষ কবি হিসেবে রাবীন্দ্রিক। বরঞ্চ তার বিপরীতই। কিন্তু কালচেতনা স্পৃষ্ট দেশচেতনায় তিনি রবীন্দ্রনাথের দ্বন্দ্বময় তৃপ্তিহীন

বিকাশকে, নিজ বিকাশে, লড়ায়ে লগ্ন করেন। (পার্থপ্রতিম, ১৯৯৪: ৪৫)

সুতরাং শঙ্খ ঘোষের সমালোচনা আসলে পরিণত হয় আত্মঅভিব্যক্তি ও আত্মমোচনের এক অভিপ্রায়ে। এক প্রসারিত আত্মশক্তির বিকাশ আকাঙ্ক্ষায় জীবনভাবনা, কবিতাভাবনা ও কবিতাসৃজন আবর্তিত হয়েছে তাঁর। কেবল ভালো কিংবা মন্দ-নির্ধারণী মূল্যায়ন তাঁর লক্ষ্যই নয়। কোনো বিশেষ তত্ত্বকাঠামোয় বা কোনো বিশেষ অভিমতের সীমায় নয়, বরং সমগ্রতা-অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়েই রবীন্দ্র-সমালোচনায় অগ্রসর হন তিনি। তাছাড়া 'এই সিদ্ধান্তে তিনি আসতে এবং আনতে বাধ্য করেন, নিজেকে এবং পাঠকদেরও যে, রবীন্দ্রনাথকে পড়তে হবে, রবীন্দ্রনাথেরই অনুপুঙ্খ দিয়ে – তার উচ্চারণে যেমন অনুচ্চারেও তার ভার অনেকটাই। তবে পাঠের ক্ষেত্রে আনন্দযাত্রী মন তাকে 'ভার' ব'লে ভাবেন না – তা-ই মুক্তি। 'আমার না বলা বাণী' – এই সংকেত তো রেখেছেন রবীন্দ্রনাথই।' (সুমন, ২০২১: ৬৩) জীবন-শিল্পভাবনার আত্মনির্ভর গদ্যে তাঁর রবীন্দ্র-বীক্ষণের অনায়াস রূপান্তর করেন শঙ্খ ঘোষ, তাতে কবির সুগভীর অনুভূতির সাথেই মিশে থাকে দার্শনিকের বহুকৌণিক, বহুতলিক জিজ্ঞাসা ও জীবনবাদী চেতনার একাত্মতা। তাঁর রবীন্দ্র-চর্চা একদিক থেকে ঐতিহ্যের অনুকীর্তনও বটে। আর এসব গুণেই রবীন্দ্রসমালোচনায় শঙ্খ ঘোষের বিশিষ্টতা চিহ্নিত হয়।

টীকা

১ *কবির অভিপ্রায়* গ্রন্থের 'লেখক' নামাঙ্কিত অংশে শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন: 'বত্রিশ বছর আগে তাঁর 'রবীন্দ্রসরণী' বইটি ছাপা হবার পর, একটা চিঠি লিখেছিলাম আমাদের মাস্টারমশাই প্রমথনাথ বিশীর কাছে। 'বলাকা'র অতিব্যবহৃত 'ছবি' কবিতাটি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সে-বইয়ের পাদটীকায় তিনি লিখেছিলেন, কবিতার উদ্দীষ্ট ছবিটি যে কার এ নিয়ে মতবিরোধ আছে। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় বা ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন সেটি কবিজায়ার ছবি, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ বা প্রভাতকুমার বলেছেন কাদম্বরীদেবীর।... এতদিন পরেও এই বিতর্কের কোনো তাৎপর্য আছে না কি এতদিনে এটা স্বতঃসিদ্ধ হয়ে যাবার কথা, এই নিয়ে ছিল আমার জিজ্ঞাসা। ত্বরিত উত্তরে প্রমথনাথ লিখেছিলেন যে ছবি যাঁরই হোক, কবিতাটির আস্বাদনে তাতে কোনো ইতরবিশেষ ঘটে না – আর এটা বলবার পর, এই এক স্মরণীয় মন্তব্য তিনি করেছিলেন সেদিন: মনে রেখো, ডিটেকটিভগিরি করা সমালোচকের কাজ নয়।... কবিতার পেছনে জীবনতথ্য খুঁজে বেড়ানোর যাথার্থ্যকেই তো ডিটেকটিভগিরি বলছেন তিনি? ওটা যাঁর ছবি হোক, তাঁর সঙ্গে তো এ-কবিতার অনেকখানি ইতিহাস জড়ানো থাকবার কথা। সে-ইতিবৃত্ত না জানলেও কবিতাটি আমাদের কাছে যে তার পূর্ণতা নিয়ে পৌঁছতে পারে, অনেকে মনে করতে পারেন সেটা।' (শঙ্খ, ১৯৯৪: ৫৮)

সহায়কপঞ্জি

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৯৬৫। *বাংলা সমালোচনার ইতিহাস,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
পবিত্র সরকার, ২০২১। 'শঙ্খ ঘোষ, স্রষ্টা ও সামাজিক', বীজেশ সাহা সম্পাদিত *মাসিক কৃত্তিবাস,* বর্ষ ৪ সংখ্যা ৭, কলকাতা।

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯৪। 'কবিতার নন্দনচিন্তা: শঙ্খ ঘোষ', অনিল আচার্য সম্পাদিত *অনুষ্টুপ* শঙ্খ ঘোষ বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা।

পিনাকেশ সরকার, ২০১২। *কবির কবিতা কবির* গদ্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ।

বিশ্বজিৎ রায়, ২০২১। শঙ্খ ঘোষের রবীন্দ্রভাবনা: একটি দিক', মলাটকাহিনি, banglalive.com। এভেইলেবল: https://banglalive.com/analysis-of-tagore-by-shankha-ghosh/ accessed on 15 May, 2023.

বুদ্ধদেব বসু, ২০০৯ । *প্রবন্ধসমগ্র* প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।

ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০০। 'নির্মাণের কুয়াশা থেকে সৃষ্টির রৌদ্রে: শঙ্খ ঘোষের গদ্য', সন্তোষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত নিঃশব্দের শিখা – শঙ্খ ঘোষ, অনুষ্টুপ, কলকাতা ।

মৃণাল ঘোষ, ২০২২। *শঙ্খ ঘোষের রবীন্দ্রনাথ ও কবিতাভাবনা,* উড়োপত্র, কলকাতা। শঙ্খ ঘোষ, ১৯৬৯ । *কালের* মাত্রা *ও রবীন্দ্রনাটক,* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা। শঙ্খ ঘোষ, ১৯৭০ । *শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা,* ভারবি [দে'জ পাবলিশিং], কলকাতা।

শঙ্খ ঘোষ, ১৯৮২। *নির্মাণ আর সৃষ্টি,* রবীন্দ্রভবন, বিশ্বভারতী।

শঙ্খ ঘোষ, ১৯৯৪। *কবির অভিপ্রায়,* রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

শঙ্খ ঘোষ, ২০০২। *শঙ্খ ঘোষের গদ্যসংগ্রহ* [তৃতীয় খণ্ড, পঞ্চম খণ্ড, ষষ্ঠ খণ্ড], দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ।

শঙ্খ ঘোষ, ২০১১। *কথার পিঠে কথা,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ।

শঙ্খ ঘোষ, ২০১৪। *নির্বাচিত প্রবন্ধ : রবীন্দ্রনাথ,* কথাপ্রকাশ, ঢাকা ।

সুমন ভট্টাচার্য, ২০২১। 'শঙ্খ ঘোষ: নিরন্তরের সূর্যাবর্ত', অরুণ কুণ্ডু সম্পাদিত *একুশ শতক,* ষোড়শ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, কলকাতা ।

সৈয়দ কওসর জামাল, ২০২১। 'রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনা ও শঙ্খ ঘোষ, অরুণ কুণ্ডু সম্পাদিত *একুশ শতক,* ষোড়শ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, কলকাতা।